ফিরে ফিরে চায় পিছে

পড়ো পড়ো জলে ভরো ভরো আঁখি

শুধু চেয়ে থাকে নিচে।'(৩২)

এই কথাগুলো যে কেবল একটা ভাবকে প্রকাশ করে তাই নয় এ যেন একটা ছবিতে স্পষ্ট করে। এতেই প্রমাণ করে ভাষার সজীবতাকে। এরা এক আঁচড়ের ছবি। এ প্রসঙ্গে একটু আমাদের পিছনে ফিরে দেখা দরকার। ১৯৮৮ সালে বাংলা প্রতিশব্দ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র-২' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত এই দেখিতে পাই, বাংলা ভাষায় ছবি আঁকা শব্দ অতি অল্প। কেবল উপরি-উপরি মোটামুটি একটা বর্ণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু একটা জাজ্জ্বল্যমান মূর্তি ফুটাইয়া তোলা যায় না। লেখকের ক্ষমতার অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। · · · আমরা কখনো প্রকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ করি নাই। আমাদের চিত্রশিল্প নাই। আমাদের চিত্রে এবং কবিতায় প্রকৃতির অতি বর্ণনাই অধিক। · · · পরিস্কার ছবি ব্যক্ত করিবার ঔদাসীন্য থাকাতে আমাদের ছবির ভাষা নাই।'(৩৩) প্রতিশব্দের সাহায্যে যে ভাষার এই দৈন্যতা পূরণ করা যায় না তা রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছু পরেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং ১৯০০ সালে লেখা 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কথা দিয়ে ছবি আঁকার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার আনাচে কানাচে তল্লাশি চালিয়ে শব্দ উদ্ধার করে এনেছেন। শব্দদ্বৈতের যে উদাহরণটি তাঁর বাংলাভাষা পরিচয় গ্রন্থের ১৩ সংখ্যক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করেছি সেটি না প্রতিশব্দ না ধ্বণ্যাত্মক শব্দ কোনো বিভাগেই পড়ে না তবু তার ছবি আঁকার ক্ষমতার গুণেই সে সাহিত্যের আসন জুড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃতের তর্জনী হেলনে চালিত। তার সহজ গতি ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানানের স্বাধীনতা দিতে গিয়ে দেখলেন এরা যা বলে তা লেখে না। তাই ভাষার ব্যবহারে গদ্যে পদ্যে ঘটতে লাগল বিবাদ আর পন্ডিত মহলের সঙ্গে মত বিরোধ। কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজতে তিনি পিছু হাঁটেন নি। 'প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উশৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পন্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই ভাল। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। · · · আমাদের প্রকৃত বাংলায় যেমূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তাঁর মর্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়মের আকারে ভালো করে আজও ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়োরাণির মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, · · · এমন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারো নেই।'(৩৪)

বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাকৃত বাংলা নাম দিয়ে আলোচনা করেছেন তার বানান ও চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তিনি বহুদিন পর্যন্ত বহু প্রশ্নের জবাবদিহি করেছেন। উচ্চারণের প্রকৃতি অনুসারে বানানের প্রকৃতি নির্ধারনের পক্ষপাতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক বাংলা বানানের একটা ব্যাকরণ সম্মত তালিকা প্রস্তুতের প্রস্তাবকে তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাতেও পন্ডিত মহলের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন নির্দিষ্ট

সময়ের সীমায় নির্দিষ্ট বানান বিধি বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৯৩৫ সালে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লেখেন— 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে আপনারা বানানের যে রীতি বেঁধে দিয়েছেন আমি তাহার সমর্থন করি। ব্যবহার কালে নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হতে পারে। এইজন্যে বছর দুয়েক পরে পুনঃসংশোধনের প্রয়োজন হবে বলে মনে করি।'(৩৫)

বাংলা বানান ব্যবহারে এই সজীব স্বভাব যেমন ভাষার গতিকে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য দেয় তেমনি ভাষারই প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ চিহ্ন ব্যবহারের শুচিবায়ুগ্রস্থতা ত্যাগের অনুরোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবল দাবি হল— ''চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিস, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর করে চললে পায়ের পরে নির্ভর কমে । প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গি দ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত। ··· ' কে হে তুমি' বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেছে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজ-ওয়ালা মহিষ। সব চেয়ে খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্ছে একটা হৃদয় ভাব— লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তা হলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি।'(৩৬)

ভাষা আলোচনার শেষ করব এই পর্বের (১৯৩০-৪০) একটি বিশেষ সংযোজন দিয়ে 'ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা'। উক্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ ও তিনটি পত্র লিখেছিলেন। সবকটির বিষয়ই প্রায় এক। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌছে গিয়েছিল যে প্রতিদিনের ব্যবহারের সামান্য বিষয়েও উভয়ের বিবাদ রাজনীতি ছেড়ে জীবনের সচলতাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। কোনো পক্ষই এতটুকু জমি ছাড়তে রাজি না। সামান্যতম সমস্যা দিনে দিনে মহীরূহের আকার ধারণ করতে থাকে। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একাধিক অভিভাষণ দিতে হয়েছে সেগুলি আমরা কালান্তরের আলোচনার সময় বিশ্লেষণ করব। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রকে ও আক্রমণ করতে ছাড়ে নি তার প্রমাণ এই প্রবন্ধগুলি।

বাংলা ভাষা বাঙালির তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। উভয়ের সম্পর্কের তিক্ততা যদি জমির সীমানা বিভাজনে উদ্যত করে তাও সয় কিন্তু এতে যদি ভাষা বিভাজনের উদ্যোগ দেখা যায় তবে বাংলা ভাষার সমূহ সর্বনাশ আসন্ন বলে ধরে নিতে হবে। সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতা বাঙালি মুসলমানদের উত্যক্ত করেছিল বাংলা ভাষার সম্প্রদায়ের অভ্যাস মত যথেচ্ছ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করে তাকে বাইরে থেকে মুসলমানের লুঙ্গী কুর্তা পরানোর। রবীন্দ্রনাথ এম.এ. আজান, আলতাফ চৌধুরী কিংবা আবুল ফজল প্রমুখ পন্ডিত ইসলামীদের বার বার বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে বাংলা হিন্দুরা ব্যবহার করে সেই বাংলা যেমন সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের তেমনি সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সম্পদশালী করেছে আরবী, ফারসী, পোর্তুগীজ, ইংরেজি, ফরাসী একাধিক বিদেশী শব্দ। সুতরাং এ কেবল হিন্দু বাঙালির একচেটিয়া অধিকার নয়। আর হিসাব করে সংস্কৃত চেয়ে বেশি পরিমাণে আরবী ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে এ ভাষা মুসলমানের প্রাণবাহী হয়ে উঠবে না। এতে কেবলমাত্র ভাষার সজীবতাই নষ্ট

হবে। ' আচারের পার্থক্যর ও মনস্তত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তাঁর অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মন্য করে ফেলা হয়। · · · শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে। বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।'(৩৭)

সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংকটকে স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথ-আলোচিত ভাষা সমস্যার বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে দেখলে তা একান্তই প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী বলে মনে হবে। বর্তমান সমস্যা'র নিরিখে তাই একবার সেই পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে এম.এ, আজানকে লেখা পত্র (১৯৩৩)

সর্বপ্রথমে বলে রাখি স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষামাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যান্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে-সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে তারে তারা ইংরেজি ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টামাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু সেটাকে স্পষ্টত স্কচ ভাষারই নমুনা স্বরূপ স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েল্‌স ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়ারল্যান্ডে আইরিশ-ব্রিটিশে ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরেজি ব্যবহার করেছেন সে অবিমিশ্র ইংরেজিই।

ইংরেজিতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত Jungle — সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না! ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্ত বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিস্ফল।

উর্দু, ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে— কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পন্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাব' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালি য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।'(৩৮)

১৯৩৪ সালে আলতাফ চৌধুরীকে লেখা চিঠি— 'আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতরো নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এতো বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলা দেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশপ্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না করে উপায় কি? বেলজিয়মে জনসাধারণের মধ্যে এক দল বলে ফ্লেমিশ, অন্য দল ফরাসি; কিন্তু ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসি ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানকার দুই সমাজের মধ্যে বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতরো প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচবে।'(৩৯)

# পর্ব-তিন : ছন্দ

ভাষার এই সজীবতা দুকূলের জনবসতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ঘরের কথা বলতে বলতে বয়ে চলা সেই স্বভাব-চলাকেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বলেছেন। তিনি পশুর চলা ও গতি এবং মানব শিশুর চলা ও গতিকে বলেছেন— মাটির কাছে হার মেনে চলা। কিন্তু তাঁর মতে বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত করে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তাঁর এই জয়লব্ধ শক্তি। তাই তো মানব শিশুকে চলার গোড়াতে করতে হয় ছন্দ সাধনা।

ছন্দ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবি পরে তাত্ত্বিক। বাংলা কাব্যে ছন্দের বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন এবং অধিকাংশ রচনাই পত্রোত্তর। দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ বিখ্যাত ছান্দসিকদের প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব দিয়েছেন তিনি ছন্দব্যাখ্যার মাধ্যমে। কিন্তু সাধারণত বাংলা ছন্দের যে আনুষ্ঠানিক বিভাগ বিশ্লেষণ ছান্দসিকদের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় তার আভাস মাত্র অনুসরণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দ-আলোচনায়। তিনি কবিতার চরণে মাত্রার চলন অনুসারে ছন্দ নিরূপন করেছেন সমমাত্রার চলন, বিষম মাত্রার চলন ও মিশ্রমাত্রার চলন। উদাহরণ দেখাতে তাঁর অন্যান্য কবিদের কবিতার স্মরনাপন্ন হতে হয় নি একেবারেই। অজস্র নতুন কবিতার পংক্তি সৃষ্টি করে এমন কি সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদ করে অনায়াসে পাঠককে বুঝিয়েছেন বিষয়টি। ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা তাঁর স্রষ্টা জীবনের একেবারে গোড়ার কথা । 'রাবনবধ ও অভিমণ্যু বধ দৃশ্যকাব্য' নাম দিয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ভারতী পত্রিকায় গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিশেষ ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা ও সমর্থন করে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লেখেন। এই আলোচনায় গিরীশচন্দ্র ঘোষকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তিনি প্রথম তাঁর ছন্দভাবনার মূল কথা জানিয়েছিলেন 'কি মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার ও শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয় , ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।'(৪০) আর তাঁর সর্বশেষ বিশ্লেষণ ও মতামত জানিয়েছেন ১৯৪০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কবি ও বিশ্বভারতীর একনিষ্ঠ কর্মী অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে ছন্দ বিষয়ক আলোচনায়। মাঝখানের দীর্ঘ ষাট বছর অনেক ছন্দ ভেঙেছেন অনেক ছন্দ গড়েছেন আর সে সব ছন্দের সৃষ্টির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অনেক।

ছন্দ তাঁর মতে কোনো সংকীর্ণ বিষয় নয়। কেবল ভাব প্রকাশের বাহন নয়। ছন্দ হল ভারসাম্য গতিবেগ। সে যেমন ক্ষুদ্র কাব্যের, তেমনি মানবের আবার একই ভাবে বৃহৎ সমাজেরও। শুধু সমাজেই বা থামি কেন এই ছন্দই তো রয়েছে জগতের চলার ধর্মে। সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্য তার বাহন ছন্দ। যে ছন্দ গতি রাখে না তাকেই বলে দুর্গতি।

লীলায়িত দেহভঙ্গি অর্থাৎ নৃত্যে হলো মানুষের ছন্দের প্রথম উল্লাস। স্বতঃস্ফূর্ত দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায় তার সৌন্দর্য। এর সঙ্গে ক্রমে এসে মেশে তার ভাবের দোলা। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে অর্থাৎ

ভাবের প্রকাশটাই, যখন লক্ষ না হয়ে, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপসৃষ্টিই যখন হয় চরম, তখন নাচটা হয় সার্বজনভোগ্য। সেই নাচ ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাতে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে। এরপর ছন্দের প্রকাশ দেহের ইশারা থেকে দেখা যায় ভাবের ইশারায়। এক্ষেত্রেও ভাষার ওজন আর ভাবের গতি দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ গড়ে ছন্দ। যখন কোনো খবর বা ঘটনা তার সীমিত অঙ্গন ছেড়ে চিরকালের বাণীরূপে প্রকাশ পেতে চায় গতি ঘোড়ার সয়ার হয়ে তখন তাকে কবি রূপদেন ছন্দে— ' সাধারণত ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে কিন্তু ছন্দে তার রূপ গ্রহণ করে।'(৪১) ভাষার সঙ্গে ছন্দের যোগ যে ঘনিষ্ঠ তা রবীন্দ্রনাথ উভয় বিষয় আলোচনার প্রসঙ্গে একধিকবার দেখিয়েছেন। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতি বিচার অত্যাবশ্যক। কবির উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। তাই সে ভাবকে প্রকাশ করে ভাষার গাড়িতে ছন্দের ঘোড়া ছুটিয়ে । পাঠকের কানে এসে পৌঁছায় সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দটা। সেই ছন্দে যদি বেসুর লাগে তাহলে কাব্য কানের ভেতর দিয়ে মরমে ঘা দেয় না। সুতরাং ছন্দের দোলাতে মাত্রা মেপে ওজন বুঝে হিসেব লেখা তাঁর সাধনাও নয় সাধ্যও নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রাধান্য বহু ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে চলে না চলে উচ্চারণের স্বভাব মতো। তাই প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায়— হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ধ্বনির দীর্ঘতার ফলে মাত্রা গণনার পরিবর্তনকেই প্রধান বলে মতামত জানিয়েছেন। ' ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে আমরা একটা কৃত্রিম মাপদন্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমাদের লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্রশঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে,
চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, এখানে দন্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে ধরা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত। অর্থাৎ উদয়-এর অয় হয়েছে দুই মাত্রা অথচ দিগন্ত-এর অন্ হয়েছে একমাত্রা, এইজন্যে 'উদয়' শব্দকেও তিনমাত্রা এবং দিগন্ত শব্দকেও তিনমাত্রা গণনা করা হয়েছে।. . . বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটা স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। . . . কবিতা লেখা শুরু করবার বহুপূর্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি 'জল পড়ে পাতা নড়'। এখানে 'জল' যে 'পাতা'র চেয়ে মাত্রাকৌলিন্যে কোনো অংশে কম, এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার মনেও উদয় হয় নি।'(৪২) বাংলা স্বরধ্বনির এই প্রসারণ ক্ষমতা খুব বেশি লক্ষ করা যায় আমাদের ছড়াগুলির মধ্যে। একটা খুব পরিচিত উদাহরণ

দেওয়া যাক—

বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

শিবঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ এর প্রত্যেক পা ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

বৃষটি/পড়ে/ টাপুর /টুপুর/নদেয়/এল /বা-ণ/

শিবঠা/কুরের/বিয়ে/হবে/তিনক/ননে/দা-ন/

দেখা যাচ্ছে, তিন গননায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পাশ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। ' আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্তি ধরবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুশকিল বৈকি; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে।'(৪৩)

ছন্দ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই জীবধর্মিতার সূত্রে গদ্যছন্দের আবির্ভাব ও বিস্তৃতির কারণ দর্শিয়েছেন। গদ্যছন্দের উদ্ভবের গোড়ার কথা হলো লিপির আবির্ভাব। কাব্য যতদিন শ্রুতি ও স্মৃতির সীমায় আবদ্ধছিল ততদিন তা পদ্যছন্দের দোলায় কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশের লাগামে বাঁধা ছিল। আজ আর কবিতা কেবলমাত্র শ্রাব্য নয় তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। গদ্যছন্দের একটা স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ রয়েছে। গদ্যকবিতার রীতি কোমলে কঠিনে মিলে সংযত রীতি। তাতে অতি মাধুর্য বা অতি-লালিত্য থাকে না। কিন্তু তার চলন উশৃঙ্খল নয়, সংযত তার পদক্ষেপ। কাব্যের প্রবর্তনায় তার গতিতে কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের অতীত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম গদ্য কবিতা লেখেন ইংরাজিতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করতে গিয়ে। বাংলা ভাষায় কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যবহারের ইচ্ছেটা তাঁর মনের মধ্যে ছিল গভীর ভাবে। ''মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, 'ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।' সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিলুম 'লিপিকা'য়, অবশ্য পদ্যের মতো ভেঙে দেখাই নি। 'লিপিকা' লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখিনি বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।''(৪৪)

এরপর দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ'। পুনশ্চের ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে পত্রবিনিময় হয় তাতে জানা যাচ্ছে ধূর্জটিপ্রসাদ পুনশ্চের ছন্দকে গানের আলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনায় রবীন্দ্রনাথও খুশিই হয়েছেন। পত্রলেখক পুনশ্চের ছন্দকে গানের আলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সেটা মন্দ হয় নি'। কারণ 'আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার

একটা ওজন।'(৪৫) রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একে বলেছেন বেড়া ভাঙা পয়ার। তাঁর মতে এ হলো কাব্যকে গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীনতা দেওয়া। তার চলনেই ত র স্বাভাবিক ছন্দ রক্ষিত হয়। আর তাই তার গতি সর্বত্র।

গদ্যছন্দের এই সহজ গতি তাকে কেবলমাত্র অকিঞ্চিৎকর বস্তুর বাহন করে তোলে না। বরং বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি তার রয়েছে। প্রতিদিনের প্রাত্যহিক ধরাবাধার মধ্যে যে অনির্বচনীয় সংগীতময়তা রয়েছে তাকে সহজেই বাণীরূপ দেয় এই ছন্দ। এখানে রবীন্দ্রনাথ যে ছবিটি এঁকেছেন তাকেই উদ্ধৃত করি—' অশোকের গাছে আলতা আঁকা নূপুর শিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না হয় কোমরে আঁট অঞ্চল বাঁধা, বা হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাতে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্ন শিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না হয় গদ্য লিরিকই হল।'(৪৬)

গদ্যছন্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পদ্যছন্দের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। বিশেষ দিনের বিশেষ অনুভূতির প্রকাশের জন্য আছে অলংকৃত কবিতা পদ্যকবিতা। প্রতিদিনের কাজের জগতের মধ্যে যে কবিতা নিহিত থাকে তাকে প্রকাশ করার জন্য গদ্যকবিতা। তার মধ্যে বেসুর, বিমিশ্রিতা সব স্থান পায়। তার চলন নাচের মত ছন্দিত নয়, বলিষ্ঠ রূঢ় অথচ মনোহর। গদ্যকাব্যের এলাকা বৃহৎ। সেই বৃহতের ভার বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের আছে। পুনশ্চের একেবারে গোড়াতেই তাই তিনি পাঠককে সচেতন করে দিলেন—

' কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন করে নিলে
সেই ছন্দে আপস হয়ে গেল ভাষার জলে স্থলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধুনক হাতে সাঁওতাল ছেলে
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে,
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা
আর মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।' (৪৭)

গদ্যছন্দ ব্যবহারের ফলে অনেক প্রতিবাদী পত্রের উত্তর রবীন্দ্রনাথকে দিতে হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বাংলা ছন্দের আলোচনায় এই গদ্যছন্দের প্রয়োগই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিণত পর্বের একমাত্র বিতর্কিত বিষয়। তাই একেবারে শেষ চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি যেন কাব্যে গদ্যছন্দের প্রয়োগের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন— ' কাব্যের ধর্ম রস সৃষ্টি করা।

যদি এই শ্রেণীর অপ্রচলিত ছন্দের রচনায় কাব্যরস থাকে তা হলে তাকে কবিতা বা কাব্য বলে গণ্য করায় ক্ষতি কী? সাহিত্যে এমন অনেক রচনার পরিচয় পাওয়া যায় যা পাঠকের চিত্তে কাব্যরসের আনন্দ দেয়, অথচ ভাব ও রসের বাহন প্রচলিত ছন্দ নয়। সেই সব রচনার মধ্যে যে ছন্দ আছে তা প্রচলিত ছন্দের কোঠায় পড়ে না। তাই বলে যদি তার রসাস্বাদনে বিমুখ হও এবং তার ছন্দের বিশেষত্বের পরিচয় জানতে চাও তাহলে উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ থেকে বঞ্চিতই হতে হবে।'(৪৮) রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত গদ্যছন্দের পক্ষ নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন এমন কি একে 'কবিতা নাম দিও না, অন্য নাম দাও, তাতেই বা ক্ষতি কী।' (৪৯) এ পর্যন্ত তিনি মানতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাই বলে একটা শিল্পরূপ চিরাচরিত বিভাগের কোঠায় পড়ে না বলে তার রসকে অস্বীকার করতে তিনি কখনই মত দিতে পারেন নি। অধ্যাপক জে.ডি. অ্যান্ডারসনকে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির দুটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদে ব্যবহৃত গদ্যছন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'I have greatly enjoyed reading two of my Gitanjali poems done into verse by your friend and thank you for sending them to me. It was the want of mastery in your langnage which originally prevented me from trying English metres translation. But now I have grown reconciled to my limitations through which . I have come to know the wonderful power of english prose . . . In english prose there is a magic which seems to transmute my Bengali verses into something which is original again in diferent manner. ' (৫০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে গীতাঞ্জলির স্বকৃত ইংরাজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের মন সন্তুষ্ট হয় নি। যে mastery একজন ইংরেজকৃত গীতাঞ্জলির অনুবাদে তিনি অনুভব করতে করতে পেরেছিলেন সেই mastery (দক্ষতা) তিনি তাঁর মাতৃভাষায় রচিত গদ্যছন্দের কবিতাগুলিতে অনায়াসে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তাই গদ্যছন্দকে কাব্যরচনার বাহন রূপে প্রচলন করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক প্রশ্ন ও সমালোচনার জবাবদিহির দায়ভার বহন করতে হয়েছে তাঁকেই। রবীন্দ্রপ্রদত্ত সেই কৈফিয়তগুলির উল্লেখ করেই এই অধ্যায়ের ইতি টানব। কবিকেও যে কাব্যধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতা বজায় রাখতে কর্মী হতে হয় তাঁর স্বাক্ষর স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশ দুটি উদ্ধৃত করলাম।

'গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে, কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে ; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক, ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে; নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয় সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরও বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূলকথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষাঙ্গিগ হয়ে। সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর-এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়।

একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পঙ্‌ক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য। এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল সে অন্তঃপুরচারিনী । প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সে দিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একত্র পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে। ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে। কাজটা সহজ হয়েছিল, কেন না তখনকার ইংরেজিশেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্সপীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দো অক্ষরের গন্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না। অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে এবং হতে পারে না তা পয়ারের উপরে নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না, এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্য-কাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য। কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সমক্ষতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে, কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়। কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিলেও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক স্বার্থকতায়।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথ চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে— যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই । এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়, এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়ও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না। বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্থ নয়।'(৫১)

'' সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকারপ্রবেশ বলে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে টিকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়— পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

মনে পড়ে একবার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম , 'ছন্দের রাজা তুমি , অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।' সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রজ্ঞাল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায়

শিল্পিত করা যায় । তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন-কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য, অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিন মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপরপক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হলো সেইরকম— অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।

গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি না।"(৫২)

## *উৎস-নির্দেশিকা*


১। সাহিত্যের সামগ্রী / সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী , ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১৯৬১। পৃ: ৭৪৫।

২। আধুনিক কাব্য/সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্ররচনাবলী , চতুর্দশ খন্ড, ঐ, পৃ: ৩৪৭।

৩। সাহিত্যের বিচারক /সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী , ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ: ৩১০।

৪। সৌন্দর্যবোধ/সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী ,ত্রয়োদশ খন্ড। পৃ: ৩১৫।

৫। সাহিত্য সৃষ্টি/সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড। পৃ:৭৮২।

৬। সবুজের অভিযান / বলাকা। সঞ্চয়িতা , দশম সংস্করণ-১৯৮৩। পৃ: ৫৩১-৫৩৩।

৭। বাস্তব /সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্ররচনাবলী , চতুর্দশ খন্ড, ঐ পৃ:৪৯২।

৮। ঐ , পৃ: ৪৮৯

৯। ঐ, পৃ: ৪৯৩।

১০। ভাষা ও ছন্দ/ সঞ্চয়িতা, পৃঃ

১১। সাহিত্যধর্ম/ সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্ররচনাবলী ,চতুর্দশ খন্ড, ঐ, পৃ:৩৩০।

১২। সাহিত্য বিচার/ সাহিত্যের পথে। ঐ, পৃ:৪৯৬।

১৩। আধুনিক কাব্য/ সাহিত্যের পথে। ঐ, পৃ: ৩৪১।

১৪। ১৯৩১ সালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র/ ১৯৮৭ সালে পূজাবার্ষিকী দেশ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৫। আধুনিক কাব্য/ সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্ররচনাবলী , চতুর্দশ খন্ড, পৃ:৩৫০।

১৬। বাস্তব/সাহিত্যের পথে।রবীন্দ্ররচনাবলী , চতুর্দশ খন্ড, পৃ:২৯৬।

১৭। বাংলাভাষা পরিচয়(২)। ঐ, পৃ:৪৫১।

১৮। ভূমিকা/সাহিত্যের পথে, ঐ, পৃ: ৯১।

১৯। ঐ, পৃ: ৯২।

২০। সাহিত্যের মাত্রা/ সাহিত্যের স্বরূপ, ঐ, পৃ: ১৩।

২১। ঐ, পৃ: ১৭।

২২। The Religion of Man

২৩। সাহিত্যের মূল্য/ সাহিত্যের স্বরূপ রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড,পৃ: ৫৩৩।

২৪। The Religion of Man

২৫। সাহিত্যের পথে/ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব - ভবানীগোপাল সান্যাল, প্রথম প্রকাশ, পৃ: ১১৭।

২৬। বিশ্বসাহিত্য/ সাহিত্য। রবীন্দ্ররচনাবলী-ত্রয়োদশ খন্ড। পৃ:৭৭৩।

২৭। সাহিত্যের তাৎপর্য/সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্ররচনাবলী-চতুর্দশ খন্ড। পৃ: ৩৬৫-৩৬৭।

২৮। ভাষার কথা/বাংলা শব্দতত্ত্ব । রবীন্দ্ররচনাবলী-দশম খন্ড। প.ব. সরকার প্রকাশিত,১৯৮৯। পৃ: ৬০৭।

২৯। জাতীয় সাহিত্য/ বাংলা শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃ: ৭১৩-৭১৪ ।

৩০। ভূমিকা দ্বিতীয় সংস্করণ/ শব্দতত্ত্ব, ঐ, পৃ: ৫৯৭।

৩১। ভূমিকা/ বাংলাভাষা পরিচয়,ঐ, পৃ: ১০১৮।

৩২। বাংলাভাষা পরিচয় (১৩) ঐ, পৃ:১০৫২।

৩৩। বাংলাভাষা ও বাঙালী চরিত্র(২) ,ঐ, পৃ: ৭১২।

৩৪। বাংলা বানান সমস্যা /শব্দতত্ত্ব , ঐ, পৃ: ৭৬৩।

৩৫। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা পত্র, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, পৃ: ৭৮৩।

৩৬। জীবনময় রায়কে লিখিত পত্র ঐ নভেম্বর ১৯৩১, ঐ, পৃ: ৭৭৮।

৩৭। কবি আবুল ফজলকে লেখা চিঠি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ঐ, পৃ:৭৯০।

৩৮। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা রাবণবধ ও অভিমণ্যু বধ দৃশ্যকাব্য / ছন্দ, ঐ, পৃ:৯৪১।

৩৯। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি /ছন্দ, ঐ, পৃ: ৮৭১।

৪০। ছন্দের হসন্ত হলন্ত/ছন্দ, ঐ, পৃ: ৮৯৬।

৪১। ছন্দের হসন্ত হলন্ত(২)/ ছন্দ, ঐ, পৃ: ৯০২।

৪২। গদ্যকাব্য/ সাহিত্যের স্বরূপ,ঐ, পৃ: ৫৮১।

৪৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (২) /ছন্দ, ঐ, পৃ: ৯২৮।

৪৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (কাব্যে গদ্যরীতি) সাহিত্যের স্বরূপ / ঐ, পৃ:৫৭৬

৪৫। কোপাই /পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ।

৪৬। কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে ছন্দ বিষয়ে আলোচনা (১৯৮০) /ছন্দ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিতি , ঐ, পৃ: ১০০১।

৪৭। ঐ, পৃ: ১০০০।